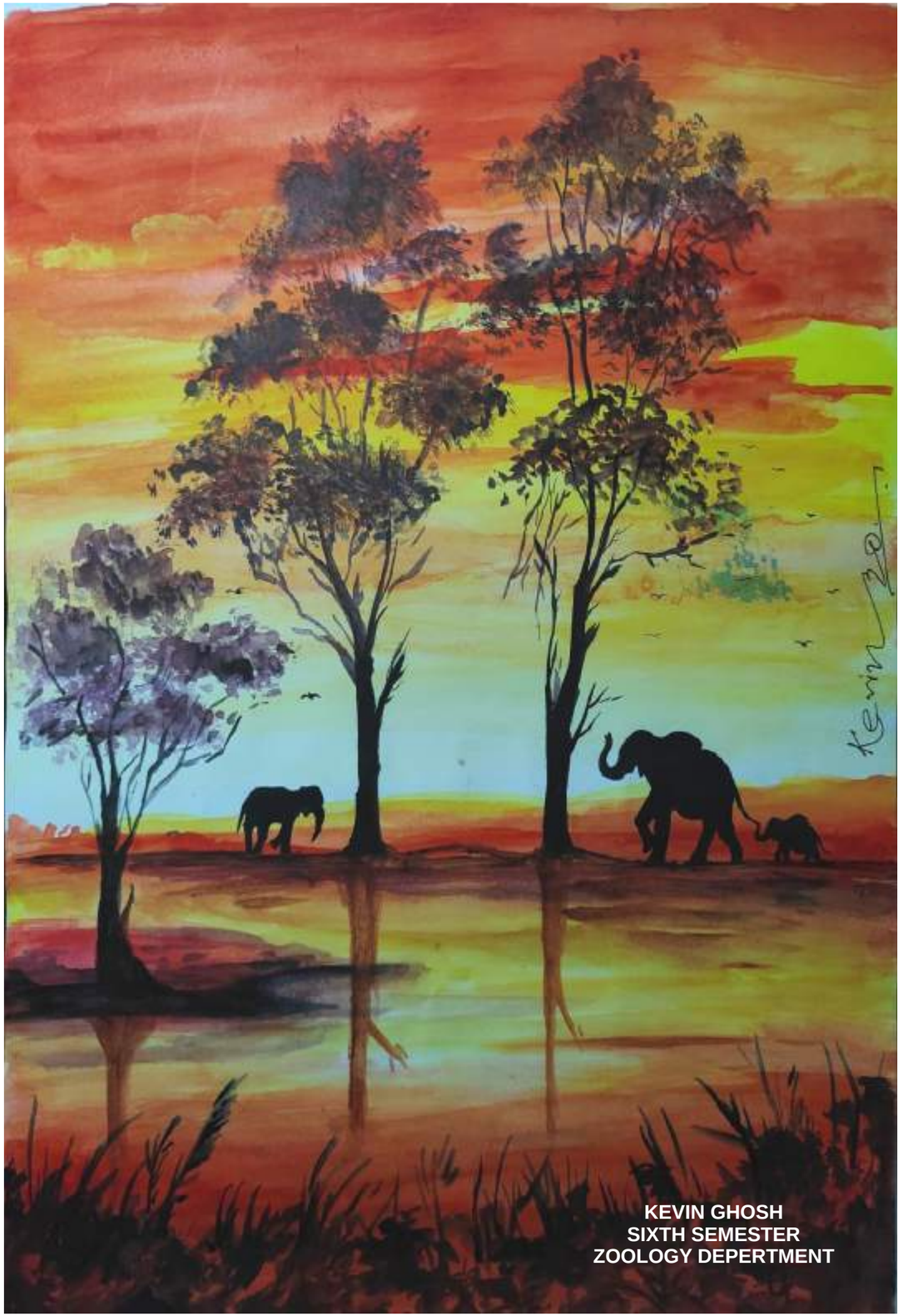

KEVIN GHOSH
SIXTH SEMESTER
ZOOLOGY DEPERTMENT

# আনন্দ ধারা

## বার্ষিক পত্রিকা ২০২১ - ২০২২

আনন্দ চন্দ্র কলেজ , জলপাইগুড়ি

# আনন্দ ধারা

## বার্ষিক পত্রিকা ২০২১-২০২২

DIYA MUKHERJEE
SECOND YEAR
PHILOSOPHY DEPERTMENT

আনন্দ চন্দ্র কলেজ , জলপাইগুড়ি

SCIENCE BUILDING OPENING CEREMONY 27-09-2022

REPUBLIC DAY PARADE A.C. COLLEGE NCC. 26-01-2022

READING CLUB 28-09-2022

STUDENT'S WEEK CELEBRATION 02-01-2023

WOMEN'S DAY CELEBRATION 08-03-2022

DISTRICT LEVEL YOUTH PARLEMENT COLLEGE COMPITION AT A.C. COLLEGE 14-09-2022

# আনন্দ ধারা

## বার্ষিক পত্রিকা ২০২১-২২

আনন্দ চন্দ্র কলেজ

কলেজপাড়া, জলপাইগুড়ি

# Annual Students' Magazine 2021-22

**Publisher :**
Principal, Ananda Chandra College

**Date of Publication :**
13th February, 2023

**Cover Page Design :**
Rudrapriya Das
Fourth Semester, Bengali Department

**Composed by :**
Ghosh Printing house
Panda Para, Jalpaiguri

# Honourable Governing Body Members

**Dr. Haraprasad Mishra, President, G.B.**

**Dr. Debashis Das, Principal & Sec. G.B.**

**Sri Bhaskar Sarkar, Member, G.B.**

**Sri Subrata Sur, Member, G.B.**

**Sri Bibekananda Adhikary, Member, G.B.**

**Dr. Debabrata Basu, Member, G. B.**

**Dr. Doli Dey, Member, G.B.**

**Dr. Diganta Chakraborty, Member, G.B.**

**Dr. Anuja Ray Chaudhury Member, G.B.**

**Dr. Ranjana Bhattacharjee, Member, G.B.**

**Sri Nirmalya Sarkar, Member, G.B.**

**Mainak Sinha**
**First Semester, English Department**

# "Knowledge is power and the acquired knowledge is the asset, which cannot be robbed by others unlike material asset."

**Dear Students,**

An institution which started functioning in the year 1942 by the active initiatives of the three great philanthropists of Jalpaiguri, Sri Nalinikanta Routh, Sri Debendra Kumar Chandra and Sri Taranimohan Chakraborty, has gradually risen to the level of a premier degree college including a postgraduate course, in the district of Jalpaiguri.

The college since its inception has been striving hard to provide quality education for the meritorious and the poorest of the poor in the society, at an affordable fees structure. The college today is an educational edifice of excellence with its most talented and experienced staff with excellent infrastructure and beautiful environment-friendly campus offering 21 undergraduate courses in arts and science and a P. G. Course in Bengali. It is a matter of pride that many of our former students have established themselves in various fieldsand professions of repute in India and abroad.

The academic year 2021-2022 has witnessed an unprecedented COVID pandemic, disrupting the life and livelihood of most of the people, and impactingits irreparable damage on education sectors. In this unforeseen situation and uncertain future we altogethertried our best to reach all the students through online teaching and successfully completed all university assignments including examinations. Despite these challenges our NSS Units put their best efforts to serve communities voluntarily, donating essential commodities through organizing camps to the nearby villages and also keep in touch with them. Besides this, we have successfully implementedthe Choice Based Curriculum System(CBCS) in our College since introduced by the affiliating university.

Due to the unavoidable situation it was not possible to publish the College magazine timely but I am confident that this issue will serve as a source of inspiration for the teachers as well as the students to contribute articles regularly to the magazine in future. This issue is a treasure of poems, stories and topics related to various branches of knowledge. I whole-heartedly congratulate the convener, the committee members, students and all stakeholders on their successful endeavor to bring out this magazine.

**Dr. Debashis Das**
**Principal,**
**Ananda Chandra College**

# MAGAZINE SUB-COMMITTEE

**Dr. Ranjana Bhattacharjee (Convenor)**

**Dr. Biswajit Roy (TCS)**

**Dr. Prosad Roy**

**Smt. Sangeeta Gupta**

**Dr. Sangita Das**

**Dr. Sudip Chakraborty**

**Dr. Munmun Roy**

**Sri Prasenjit Chakraborty**

**Sri Ripan Ghosh**

**Smt. Abira Sengupta**

**Sri Shibshankar Chowdhury**

**Smt. Asima Sarker**

**Smt. Jui Debnath**

**Sri Subal Chandra Barman**

**Dr. Shamim Akhtar Munshi**

**Sri. Samik Dasgupta**

**Dr. Diganta Chakraborty (Invitee)**

**Dr. Chinmoykar Das (Invitee)**

**Dr. Anuja Roy Choudhury (Invitee)**

# With active co-operation of the following students

**Artik Ahmed**

**Santanu Dutta**

**Tomaghna Das**

**Debjani Chakraborty**

**Diti Sutradhar**

# আমাদের কথা...

শীত শেষে বসন্তের দোরগোড়ায় আনন্দ চন্দ্র কলেজের বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশিত হলো। দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষার পরে খুব দ্রুত উদ্যোগ আয়োজন করে আমরা পত্রিকাটি প্রকাশ করতে পারলাম। ২০২০-২১ সালে লকডাউনের কারণে আমরা সুস্থ জীবন থেকে অনেকখানি সরে এসেছিলাম। সেই কারণে ওই বছর কলেজের পত্রিকা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের মতোই বলতে ইচ্ছে করে -

‘ আলোর চোখে কালো ঠুলি পরিয়ে
তারপর খুলে—
মৃত্যুর কোলে মানুষকে শুইয়ে দিয়ে
তারপর তুলে --
যে দিনগুলি রাস্তা দিয়ে চলে গেছে
যেন না ফেরে...

‘চোখে ঠুলি’ না পরলেও মুখে মাস্ক পরা দুঃসহ দিনগুলি যেন আর না ফেরে। কিন্তু ঘরে বন্ধ থাকলেও আমাদের কলম যে সচল ছিলো সাহিত্যপত্রগুলি তার প্রমাণ।

আশি বছর অতিক্রান্ত আনন্দ চন্দ্র কলেজ চলে যাওয়া ছেলে-মেয়েদের স্মৃতিকে বুকে নিয়ে নতুন ছাত্র-ছাত্রীদের সমাগমে আবার ভরে উঠেছে। তাদের নতুন ভাষা নতুন কল্পনাকে তুলে রার জন্যই ‘আনন্দাধারা’ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ। একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদের সাংস্কৃতিক ও সৃজনশক্তিকে উৎসাহিত করা প্রতিষ্ঠানের অন্যতম লক্ষ্য । একটি কলেজ-পত্রিকা সেই দিকগুলির উন্মোচন ঘটায়।

আমাদের ‘আনন্দাধারা’য় নতুনদের সঙ্গে পুরনোরাও হাত মিলিয়েছে। প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের লেখা পাঠানোর আবেদন জানালে তারা সময় মতো আমাদের লেখা পাঠিয়ে দিয়েছে। বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি অ্যাধাপকেরা তাঁদের লেখা দিয়ে পত্রিকাটিকে পূর্ণাঙ্গতা দিয়েছেন।

এবারের ‘আনন্দাধারা’ কবিতা গল্প অণুগল্প ছড়া স্মৃতিকথা ভ্রমণসাহিত্য বিভিন্ন স্বাদের লেখায় সেজে উঠেছে। আমরা যে সব উচ্চমানের লেখা পেয়েছি তা নয় কিন্তু ছাত্র-ছাত্রীদের নিজেদের ভাষাকে জানাতে পেরেছি। তার পাশাপাশি বেশ কিছু পরিণত লেখাও আমরা পেয়েছি যাদের লেখা অন্যদের দিকনির্দেশ করতে পারবে। উৎসাহিত করার জন্য সব ধরনের লেখাকেই আমরা এবারে বেছে নিয়েছি।

পরিশেষে ধন্যবাদ জানাই কলেজের পরিচালন সমিতিকে যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় পত্রিকাটি প্রকাশিত হলো। ম্যাগাজিন সাব-কমিটির সদস্যদের কৃতজ্ঞতা জানাই তাঁদের সাহায্যের জন্য। যখন যেভাবে সাহায্য চেয়েছি তা পেয়েছি। তাঁদের সাহায্য না পেলে এতো কম সময়ের মধ্যে পত্রিকাটি বের করা সম্ভব হতো না। সর্বোপরি ছাত্র-ছাত্রীরা যদি পত্রিকা প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ না করতো তাহলে ‘আনন্দাধারা’ আলোর পথ দেখতো না। তাছাড়া কলেজের শিক্ষাকর্মীরাও সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন - তাঁদের ধন্যবাদ জানই।

২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের বার্ষিক পত্রিকাটি ২০২৩ সালে ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের পত্রিকার সঙ্গে প্রকাশিত হলো। এর পর থেকে ‘আনন্দাধারা’ নামেই কলেজের পত্রিকাটি প্রকাশিত হবে- এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

'আনন্দাধারা' বহু আলোকবর্ষ রে প্রকাশিত হয়ে চলুক - এই কামনা করি।

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৩
২৯ মাঘ, ১৪২৯

ড. রঞ্জনা ভট্টাচার্য
আহ্বায়ক
ম্যাগাজিন কমিটি

# শুভেচ্ছা বার্তা

কলেজের সকল ছাত্র ছাত্রীকে আমার ভালোবাসা এবং শিক্ষক - শিক্ষিকা ও শিক্ষকর্মীদের আমার প্রণাম। এ ছাড়া পত্রিকা কমিটির সদস্যদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই।

কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিভাকে এই ম্যাগাজিনের মাধ্যমে সমাজের কাছে পরিচিত করবার যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তা প্রশংসনীয়। আগামীদিনে আমার বিশ্বাস আমাদের আনন্দচন্দ্র কলেজ থেকে বিশ্বের দরবারে ভালো লেখক-লেখিকা আমরা উপহার দিতে পারবো তোমাদের এই পত্রিকার মধ্য দিয়ে।

এই পত্রিকার সাফল্য কামনা করি।

**দেবজীৎ সরকার**
**প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক**
**ছাত্র সংসদ (২০১৬-২০১৭)**

**Debjani Sarkar**
**Sixth Semester, B.A Pass**

# সূচিপত্র

**কবিতা** **পৃষ্ঠা**


১. অভিজান - ঋষভ চক্রবর্তী ১১
২. নদীর কথা - ভাস্কর রায় ১১
৩. অমার পরাণ যাহা চায় - অহনা সোম ১২
৪. শীতকাল নিয়ে গুচ্ছ কবিতা - মেঘা ভট্টাচার্য ১২
৫. সময় গড়ার - শুভরাজ ১৩
৬. ফিরে এসো বিদ্যাসাগর - মৌমিতা তেওয়ারি ১৩
৭. এবং দেখা হবে - অদৃতা দে রায় ১৪
৮. পলাতকের চিঠি - মুন্নী সেন ১৫
৯. Garden - Akash Bharat ১৫
১০. Blemishes of the Broken Words - Debaditya Chakraborty ১৬
১১. The Infinite - Nikita Ghosh ১৬
১২. Sorrow of Achilles - Susmita Barman ১৭
১৩. I wanted to be surprised - Samik Dasgupta ১৮
১৪. After I found you - Siara chik Baraik ১৯
১৫. Leaf - Jayanta Bhakta ১৯


**ছড়া–**


১৬. ঠান্ডার সুর - প্রীতম মজুমদাব ২১


**গল্প /অণুগল্প**


১৭. অদ্ভুতুরে - সূর্য্যদীপ্তা সরকার ২২
১৮. তিতলির স্বপ্নপূরণ - বর্ণালী সেন ২৫
১৯. নপুংসক - অঙ্কিতা সেন ২৬
২০. ফিরে দেখা - প্রিয়াংশু দত্ত ২৭
২১. Deathless - Ayanaditya Roy ২৮
২২. Farewell Blues - Nandini Roy ২৯
২৩. LA Whisper Of Justice - Sohini Bal ৩০


**ভ্রমন কাহিনি**


২৪. চলো যাই কার্শিয়াং - অঙ্কিতা বিশ্বাস ৩২


**প্রবন্ধ**


২৫. Defunct United Nations - Chinmaykar Das ৩৫

**Mainak Sinha**
**First Semester**
**English Department**

# কবিতা

## অভিযান

ঋষভ চক্রবর্তী
চতুর্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

সমুদ্রের বিষণ্ণ সন্ধ্যায় রাশভারী নাবিকের মন,
তবুও একাকীত্ব খুঁজে চলেছে ব্যর্থ মুক্তিপণ।
শুধুই কি জনশূন্য দ্বীপ আবিষ্কারের অভিযান?
নাকি অভিশপ্ত জাহাজে নাবিকের সংগ্রাম?

ক্রমে ক্রমে মৃদু আলোও হতে থাকে নিঃশেষ,
যদিও নাবিকের মনে ছিল না কোনো ক্লেশ।
তবু মনে নিয়ে একরাশ আশা ও উন্মাদনা,
উত্তাল সমুদ্র পথে ঝড়-বাতাসে, স্রোতের ছলনা।

নাবিক কি ভোলে যাত্রাপথের অপরূপ স্নিগ্ধতা?
ওঁর মনে আজ ভয়ঙ্কর মনোবলের তীব্রতা।
উপহাস সহন করে, যাত্রা পথে দিয়েছিল পাড়ি,
চারিদিকে শুধুই জল, দ্বীপের সন্ধান তবুও জারি।

অবশেষে নাবিক পেল স্বপ্নাতীত দ্বীপের সন্ধান,
অবিশ্বাসীদের কাছে বাস্তবেই মিললো প্রমাণ।
মনোবল সহিত, ফিরে এলো যাত্রা শেষে;
নতুন অভিযানের পথে, সফল জয়ীর বেশে।

## নদীর কথা

ভাস্কর রায়
প্রাক্তন ছাত্র, বাংলা বিভাগ

গ্রীষ্মে যা মন হারিয়ে নির্জন হয়ে থাকে
সেই আবার মেতে উঠত বর্ষা কালে
আজ দুঃখে জল নিয়ে সে বলে
বলছো কেন আমায় অহংকারী মৃত ?
একটুতো সুখ দেবে আমায়!
আমার কথায় কান দেবে না কেউ?
আমারও তো স্বাধীনতা আছে
আজ নেই আর সেই স্বাধীনতা!
সব হয়েছে শেষ ;
এখন শুধু কারাগারে বন্দি করে রাখে
যদি পারতাম চলতে একা আর
সেই মহাসুখ আর হত না কোনকিছু
তবুও চলি পরাধীন হয়ে
সর্বনাশ হচ্ছে, কেঁদে ভাসাচ্ছে অঝোর ধারায়
মারধর, কেলোর কীর্তি হয়
কারনে অকারণে।
মনের চিন্তা প্রেম দিয়ে নয়
জমানো কয়লায় মলিনতা খোঁজা,
ময়ূরীর নগ্নতা হওয়া অর্থেরই।
বৃষ্টির পরে দুপুরে রৌদ্রের খরা তাপেও,
মাঠের ভ্যাপসা জলে মন দিয়ে
কি পেলো সে।
এক ধাপ এগিয়ে, গুটিয়ে সময়
রং কালো করে
চামড়ায় কড়া ওষুধ লাগিয়ে
দিব্যি তো মনটা জনবলে গুছিয়ে রাখা,
তারপর শেষ ধাপে মন রাখা কেন শেষ ,
স্মৃতির পাতায় সমর্পণ শেষ রানে
নয়তো বা পিছিয়ে পড়া কেন!
শুরুই!
শেষ চাই।

# শীতকাল নিয়ে গুচ্ছ কথা

মেঘা ভট্টাচার্য
প্রাক্তন ছাত্রী, বাংলা বিভাগ

১. জলের  বুকে চাপ চাপ কুয়াশা জমার পরে
পথ খুঁজে না পেয়ে, তোমার চোখে আলো খুঁজতে খুঁজতে
সন্ধ্যা নামে ।
তোমার চোখে সরীসৃপের শীতলতা
আমাকে আষ্টেপৃষ্টে গ্রাস করে
সব শেষের আগেও ফস করে দেশলাই
উষ্ণতা আনে ।

২. অনেকদিন চিঠি লিখিনা
আজ লিখতে বসে হাত জমে যাচ্ছে বরফে
বরফ আর বরফ...
কতটা বরফে সাঁকো বন্ধ হয় তুমি জানো?

৩. পথ না  খুঁজেই রওনা হয়ে আজ
হারাতে হারাতে জল জমে চাই চাই বরফ...
এতো শীতলতা আর সয় না
এতো মেঘ মেঘ অন্ধকার
হৃদয়হীন ঘূর্ণিঝড়...
তবু বৃত্ত জানি
সাঁকোর শেষে,তোমার চোখ ভোরে
পারিজাত ফুটুক ।

# আমার পরান যাহা চায়

অহনা সোম
প্রথম সেমিস্টার, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

আমার পরান যাহা চায় তুমি তাই, তুমি তাই গো
আমার পরান যাহা চায়
তবে,তুমি ছিলে কোথায় ? কোন নীরবতায় ?
কোথায়, কোন মন-মাঝারে
সকাল সাঁঝে আসতে তুমি আলো-আঁধারে ?
তোমার কাছে তো আমি ছিলাম এক্কেবারে অজানা-
তবে  কেন আমায় নিয়ে স্বপ্নে মেলেছিলে ডানা!
জানি না , এভাবে আমিও কখন চলে গেছি উড়ে,
তোমার হাতটি ধরে দূরে, কতদুরে-
চেয়েছিলাম মনের দরজাকে আটকে রাখতে
তবে পারিনি তোমার উপেক্ষা করতে
খুলে দিয়েছি তাই সেই প্রবেশপথ-
সাজিয়ে দিয়েছি এক ইন্দ্রসম রথ
হঠাৎ একদিন চেয়ে দেখি তুমি আসছো
দীর্ঘ রথযাত্রা ক্লান্ত হয়ে নিবিড় আশ্রয়ের জন্য আসছে।
মনে মনে ভাবলাম, ভাগ্যিস সেদিন ফিরিয়ে দিইনি,
শুরু করেছিলাম এক উড়ান
তাই তো হলো আজ এই স্বপ্নপূরণ।
কিন্তু , কিন্তু - হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, দেখলাম শুরু হয়েছে এক প্রবল ঝড়
পেয়ে পাশে চেয়ে দেখি, নাহ্ ,চলে যাওনি তুমি,
রয়ে গেছো তুমি আমার কাছে সারা জীবনভর।।

# সময় গড়ায়

শুভরাজ
চতুর্থ সেমিস্টার, ইংরেজি বিভাগ

সময় গড়ায়....
লেখাগুলি ঝাপসা হয়, চশমার কাচ পুরু হয়;
স্মৃতির পাতায় ধুলো জমে।

পুরনো ফ্রেম.....
আরও পুরনো হয়,
বদলানো হয়ে ওঠে না।

কেন?
ভালবাসা যে-
কখনোই পুরনো হয় না।

তোলা থাকে...
মনেরই এক কোণে
সযতনে, সঙ্গোপনে.....
নৈঃশব্দরা যেখানে....
চুপিসারে বসবাস করে।

সময় গড়ায়....
ফুলগুলি বাসি হয়।

# ফিরে এসো বিদ্যাসাগর

মৌমিতা তেওয়ারী
অধ্যাপিকা, দর্শন বিভাগ

মায়ের জন্য সাঁতরে পার
নদ দামোদর
মাতৃভক্তির প্রতীক তুমি
হে বিদ্যাসাগর
বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহের বিরুদ্ধে
তোমার কঠোর তেজোদীপ্ত প্রতিবাদী কণ্ঠ
শিশুশিক্ষা, স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে
তোমার অসীম ধৈর্য্য ও সাহস
বিভ্রান্ত কবির তুমি পথ প্রদর্শক
অসহায়ের তুমি বটবৃক্ষ
নারীদের তুমি ঈশ্বর
তোমার দুয়ার হতে ফেরেনি কেহ
উজাড় করে দিয়েছো নিজের সর্বস্ব
দয়ার সাগর তুমি বিদ্যার সাগর তুমি
ফিরে এসো বারবার
আজও বিধবাদের শুনতে হয় বহু কটু কথা
শিক্ষার নামে চলছে আজও অশিক্ষার প্রসার
বিভ্রান্ত আজ তোমার দেশ
অন্ধকারাচ্ছন্ন এই সমাজ
আজ আবার তোমাকে চাই
ফিরে এসো বিদ্যাসাগর
ফিরে এসো আবার।।

# এবং দেখা হবে

সাহুতা দে রায়
পদার্থবিদ্যা বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার

আমাদের দেখা হবে।

যখন আমার শঙ্খধ্বনি আর তোমার কলমার শব্দতরঙ্গ-
পরস্পর উপরিপাতিত হয়ে মিলিয়ে যাবে কালগর্ভে;
আমাদের দেখা হবে।

যখন তোমার আজানের সুরের সাথে মিশে যাবে আমার দেবীবন্দনের ভৈরবীর সুর,
যখন তোমার ঈদ আর আমার কোজাগরী চাঁদ সমাপতিত হবে একই আকাশগঙ্গায়,
আমার জল আর তোমার পানির সম্মিলিত বারিধারা ঝরে পড়বে ধরিত্রীর রন্ধ্রে রন্ধ্রে,
যখন বসুধার জরায়ু থেকে জন্ম নেবে
সহাবস্থানের স্বাদুজলীয় তড়াগ;
আমাদের দেখা হবে।

আমাদের দেখা হ'ল।
সেদিন 'আল্লাহু আকবর' আর কালীকাবন্দনের মিলিত ধ্বনিতে মুখরিত হয়েছিল বাতাস।
তখন,শ্বেত ও গৈরিক বস্ত্র পরিহিত তোমার আর আমার ধর্মের মানুষ মেতে উঠেছিল রণোন্মাদনায় ,
সবুজ ঘাসের গালিচার ওপর।
চারিদিকে ছড়িয়েছিল আগুন আর অঙ্গার।
ওরা ভেঙ্গে দিয়েছিল তোমার মসজিদ আর আমার মন্দিরের সুদৃশ্য কাঠামো।
সেদিন পাশাপাশি ছড়িয়ে ছিল দুটো রক্তাক্ত, ছিন্নভিন্ন শবদেহ।
নারী ও পুরুষের,
তোমার আর আমার...

আমাদের দেখা হল।

আমাদের দেখা হয়েছিল।

# পলাতকের চিঠি

মুন্নি সেন
ষষ্ঠ সেমেস্টার, বাংলা বিভাগ

অনেককিছুই ঘটবে সাক্ষাতে, অনেককিছু আড়ালে
পা থেকে মাটি বদলে হয়ে যাবে আগ্নেয়গিরি
বাবার স্বাস্থ্য... মায়ের গয়না
বড় হওয়ার সাথে পাল্লা দিয়ে কমতে থাকবে
অসতর্ক ভালোবাসায় কবিতাসম্ভবা শরীর
গলায় আঙুল দিয়ে বমি... আবশ্যক ভাত ছড়িয়ে ফেলা... ইত্যাদি অনেককিছুই ঘটবে
মননে ও মগজে
সিলিংফ্যান বারবার ওড়নার জন্যে প্রস্তাব দিতেই থাকবে
খবরদার, তুমি যেন থতমত খেয়ে পালিয়ে এস না।

# Garden

**Akash Barat**
**Fourth semester English Department**

Mother told her son,
This world is a beautiful garden Where people are flowers of different species.
Its upon you which one you choose,
You may either get inclined towards the Dandelions or the red roses.
But don't fall for their countenance,
As you might know all beautiful things come with a defect in it,
And sometimes their appearances can be deceptive.
They flatter with their smell but can prickwith their thorns,
They matter when they are lost and be thereason of your scorn.
A benignant show is often trifle,
If overlooked can be the cause of someone's befell.

# Blemishes of the Broken Words

**Debaditya Chakkraborty**
**Third semester, English Department**

My Words Tend To Fade Away...
When I've A Lot To Say...
No I Won't Recurrent The Same Mistakes...
Cause You've Told Me Not To Walk In Those Shoes Again...
You're Not The One On My Right...
You're The One Who's Responsible For Those Strange Feelings On My Left...
You're Too Fidget To Let Me Speak...
I'm Not In A Hurry So It Won't Be Quick...
Acclaiming Your Norms I'll Wait...
You Sheild Your Heart Everytime Someone Knocks...
This Is The Last Time I'll Try Not To Lose What I Have...
No I've Not Fallen For The Moon...
It's The Sun That's Gonna Burn Me Into Ashes Soon...

# The Infinite

**Nikita Ghosh**
**Sixth semester, English Department**

Do you see the light?
The beaming rays of the winter sun that generate healing,
The mild shimmer of sunset that provides solace,
Can you see through the darkness?
The hushed hope that stays within violent storm,
The beaming moon that gives refuge after the destruction,
Can you see that light?
The one that's always hidden inside.

# Sorrow of Achilles

**Susmita Barman**
**Sixth semester, English Department**

Even the sky is clothed in mourn
When Achilles weeps beside his lover no more
Kinder than any soul, the healer of man
Now lie in a soaked bed, smothered in cold embrace.

The wicked Fate chased the young lovers
From Phthia to the Ilion Shores
For Achilles was to gain glory and die young.

Dawn came again; the waves swept the foreign shore.
Again the God-born pressed his lips to his
Hoping to wake him with his tenderest kiss
As the unhappy hero with his eyes close
Touched the strings of unheard sorrow,
The bright joys of boyish days
Flashed before his doleful face.
Beneath the summer sun, down the Pelion
Hand in hand, two fair Youths ran.
Sad tune rose from deep within his crying soul,
And glided past the Aegean
To the Heliconean Maiden.

# I Wanted to be Surprised

**Samik Dasgupta**
**Assistant Professor**
**English Department**

I don't know why I was surprised
everytime love started or ended,
Or why each time a new
Lynching, solidarity or war.
Or that no one kept being there
Where clearly remained the lack-of-humanity.

What should not have been so surprising:
my error after error, recognized
When appearing on the faces of others

What did not surprise me enough:
my daily expectations that
"Kuch bhi" would continue,
And then that so much did continue,
when so much did not.

Muslims and Dalits still making their stand
when it wasn't even safe.
A litter of puppies birthing.
Also the stubborn, courteous persistence -

That even today, help means help.

Aam Aadmi Party is still understood as caring for the Aam Aadmi,
and that when I wake up,
the window's distant billowing smoke
Remains smoke,
the borrowed city around me is still a city and standing.

Its alleys, markets, offices of brokers, its metro service that charges - a happy service-
no fine for carrying a bleeding conscience:

***Jaffrabad, Maujpur-Baburpur, GokulPuri, Johri Enclave and Shiv Vihar metro stations to remain closed.***

***Trains are being terminated at Welcome now.***

To such a request, the world is obliging.

Just yesterday, a bullet-ridden man's belly,
Equally startled by the apparent calm on the man's terrace.

The man who swallowed a tiny megaphone
To project the voices inside his head,
not considering beforehand
how to remove it -
An aborted foetus and burnt rotis on a garbage bed.

How easily the young unemployed
were caught in the net of propaganda,
surprised even them.

# After I Found You

**Siara Chik Baraik**
**Sixth semester, English Department**

It was a rainy day with lots of thought and despair,
You found me shivering and treated me with care.
Everything had taken a musical pace,
Listen! God has recompensed my emptiness.
You know somehow you look like a part of me,
I can see a dream house and you are the key.
All I want is you, a window, a cradle, and the alluring view,
Oh! Everything has started smiling after I found you.

**Jayanta Bhakta**
**Sixth semester, English Department**

O leaf!
Green bright leaf...
You hang like a cloud
Floating in the sky.
Thy green color shows life
Like a youthful man.
O leaf!
Yellow faded leaf...
Now you are like me
Worn, torn and old.
Now it's time for
Both of us to fall.

**Mainak Sinha**
**First Semester, English Department**

# ছড়া

## ঠান্ডার সুর

প্রীতম মজুমদার
প্রথম সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

দূর দূর দাঁপানি
ঠান্ডায় হাঁপানি
বায়ু বয় কাঁপানি
সোয়েটার পরে নি ?
কুয়াশার ঝাঁপানী ।
রাত বড়ো কাটে না
দিন ছোটো থাকে না
তাই বলি কেঁপো না
কাম কাজ ছেড়ো না
করে যাও , লড়ে যাও
ঠাণ্ডা কে ভুলে যাও।

# অদ্ভুতুড়ে

সূর্য্যদীপ্তা সরকার
চতুর্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

পাড়াগাঁয়ের এক স্কুল,পঁচাত্তর বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে বেশ জাঁকজমক সহকারে অনুষ্ঠান চলছে। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার কথা ছিল বেলা বারোটায়,অথচ আমার হাতঘড়ির কাঁটা মিলিয়ে দেখেছি ঠিক দুপুর দুটো বাজতে পাঁচে অনুষ্ঠান আরম্ভ হল।অবশ্য এ আর নতুন কী! বাঙালির সময়জ্ঞান নিয়ে আমারও জ্ঞানের অভাব নেই।শুধু সংশয় আছে, বাঙালিরা দেরিতে চলে!নাকি বাংলার ঘড়িগুলোই চলে বেশি আগে আগে!

যাই হোক,অবশেষে সঞ্চালক মশাই মাইকে বলে উঠলেন, 'আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন স্বনামধন্য কবি শ্রীযুক্ত নির্ঝর সেনগুপ্ত। তাঁর আরও একটি পরিচয় না দিলেই নয়, তিনি আমাদেরই এই স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষার্থী;এ যে আমাদের বিদ্যালয়ের কতবড়ো গৌরবের কথা!'

এই এক সুবিধে,গৌরব প্রাপ্তির সুযোগ সহজে কেউ হাতছাড়া করতে চায়না।তাই আমার মতো উঠতি কবিকে 'স্বনামধন্য' আখ্যা দিয়ে স্কুলের গৌরববৃদ্ধি করার সুযোগটুকু ছাড়তে পারেনি স্কুলকর্তৃপক্ষ।সবেমাত্র দু-একখানা পত্রিকায় লেখা বেরোচ্ছে,তাও সকলে যে তা পড়ে প্রশংসায় পঞ্চমুখ হচ্ছেন,এমনটাও নয়।এমতোবস্থায় নিজের পুরোনো স্কুলের অনুষ্ঠানের মঞ্চে এমন সুখ্যাতি শুনতে মন্দ লাগছিল না।
ওদিকে সঞ্চালক বলে চলেছেন, 'নির্ঝরবাবু,আপনাকে মঞ্চে এসে কিছু মূল্যবান বক্তব্য পেশ করার অনুরোধ জানাচ্ছি।'

মাইকের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বাড়ি থেকে তৈরি করে আনা বক্তব্যের পয়েন্টগুলো মনে মনে আউড়ে নিলাম। গাম্ভীর্য ফুটিয়ে তোলার জন্য গলাটা একটু ভারী করে শুরু করলাম বক্তৃতা।বক্তৃতার মূল বিষয়,প্রতিটি মানুষের নিজস্ব প্রতিভা থাকে,সেই প্রতিভার বিকাশ ঘটলেই সাফল্য নিশ্চিত। শুধুমাত্র পুঁথিগত শিক্ষা কিংবা মুখস্থবিদ্যার জোরে হয়তো ডিগ্রি অর্জন করা যায়,কিন্তু এই পৃথিবীর আসল প্রাপ্তিটুকু অধরাই থেকে যায় ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে পড়ে গেল, এই স্কুলে পড়াকালীন আমাদের এক শিক্ষক ছিলেন,বিজ্ঞানের শিক্ষক, নাম সুরমোহন দাশ। অন্যান্য মাস্টারমশায়েরা ওঁকে সুরবাবু বলে ডাকতেন,আর আমরা আড়ালে ডাকতাম অসুরবাবু বলে। ডাকবো নাই বা কেন!অমন বিশাল চেহারা,বাজখাঁই গলা আর বেতের বাড়ি তাঁকে আমাদের কাছে অসুর করে তুলেছিল। তবে মানতেই হবে ওঁর জ্ঞানের পরিধিও ছিল চেহারার মতোই বিশাল।আবার উনি নাকি গাধা পিটিয়ে ঘোড়া,থুড়ি,ছাত্র পিটিয়ে মানুষ করার উপযোগী একখানা যন্ত্র আবিষ্কার করার সংকল্প নিয়েছিলেন। স্যার নিজেই সে কথা ক্লাসে জানালে পুলক বলে উঠেছিল, 'স্যার,এই যন্ত্র আবিষ্কার করলে তো দেশে আলাদা করে শিক্ষকের আর প্রয়োজনই হবেনা।আপনার চাকরি চলে যাবে যে!'

শুনে 'অসুরস্যার' 'চতুষ্পদ', 'অকালকুষ্মাণ্ড', 'মূর্খশিরোমণি' প্রভৃতি বলে সাধুভাষায় গালিবর্ষণ করেছিলেন।

একবার দেওয়ালপত্রিকায় আমার একটি কবিতা বেরিয়েছিল,শেষ লাইনটি ছিল,
'কোন অসীমের সূত্রে বাঁধা ওই দিগন্তরেখা!'
পরদিন অসুরবাবুর ক্লাসে প্রথমেই আমার ডাক পড়লো, 'এই যে নির্ঝরবাবু,দাঁড়ান।অসীমের সূত্র ছেড়ে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটির সূত্রটা বল দেখি! শুনে আমি ঈশ্বরপ্রদত্ত কর্ণ দু-খানি সার্থক করি।'

যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই সন্ধে হয়। স্যার ওই চ্যাপ্টারখানা পড়ে আসতে বলেছিলেন,এদিকে কাল সারারাত তো আমি আকাশকুসুম কল্পনায় ব্যস্ত ছিলাম।এবারে কি আর আমার কর্ণদুটি আস্ত থাকবে!
আমার অসহায় মুখ দেখে স্যার বলা শুরু করলেন, 'ছ্যা ছ্যা, এরা কিনা দেশের ভবিষ্যত!আর এই ভবিষ্যত গড়ার দায়িত্ব এসে পড়েছে আমার ঘাড়ে!হায় রে! কত জন্ম পাপ করলে যে শিক্ষক হয়ে জন্মাতে হয়! জগতটা একেবারে রসাতলে চলে গেল।'
আমার মতো এক নগন্য ছাত্র 'থিওরি অফ রিলেটিভিটি' না জানলে এত বড় জগতটা কোন দুঃখে রসাতলে গিয়ে ঠেকবে,সেটাই ভেবে বের করার চেষ্টা করছিলাম।

বেত উঁচিয়ে স্যার প্রশ্ন করলেন, 'পড়োনি কেন? বিক্রমাদিত্য কি তোমায় সভাকবি করে নবরত্ন সভায় নিয়ে গেছিল বাছা?নইলে পড়ার সময় পেলেনা কেন?'
মুখ কাঁচুমাচু করে উত্তর দিলাম, 'আজ্ঞে স্যার,মানে,ইয়ে ভাবছিলাম স্যার। ভাবতে গিয়ে আর সময় পাইনি।'
স্যার ঝাঁঝিয়ে উঠলেন, 'বাঃ বাঃ! নিউটন,আইনস্টাইনেরা ভেবে ভেবে কত কী করে ফেললেন। আর এদিকে ইনি ভেবে ভেবে রবিঠাকুর হবেন! কবিদের তো বেতের বাড়ি দেওয়া চলেনা,কান ধরে দাঁড়িয়ে থাকো বেঞ্চের উপর।'

এ তো মহা বিড়ম্বনা,বেতের আঘাত তবুও বীরের মতো সহ্য করে নিতাম। কিন্তু পুরো ক্লাসের সামনে বেঞ্চের উপর! এ যে অপমানের একশেষ।

সেদিন থেকে স্যারের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলেও মনের মধ্যে কোথাও একটা অভিযোগ জমে ছিল। আজ বক্তৃতা দিতে গিয়ে সেই অভিযোগ প্রকাশ করে ফেললাম। কেউ ভেবে ভেবে বিজ্ঞানী হয়, কেউ বা কবি, দুটোর কোনোটাই ফেলনা নয়। ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বললাম, 'তোমরাও পড়াশোনা করো,পাশাপাশি নিজের যা ভালো লাগে সেটা চালিয়ে যাও। ব্রেনের উন্নতি যেমন প্রয়োজন,তেমনই মনেরও বিকাশ প্রয়োজন।বইয়ের চাপে সুকুমার প্রবৃত্তিগুলো যেন হারিয়ে না যায়।মনে রাখবে,একটি চ্যাপ্টার মুখস্থ করে তুমি যতটা জ্ঞানী হবে,ঠিক ততটাই উন্নত হবে ওই উদার আকাশটার দিকে চেয়ে চেয়ে,পাখিদের কলকাকলি শুনে,গাছেদের বন্ধু হয়ে।শুধুমাত্র ইঁদুর দৌড়ে ছুটে চলাই জীবন নয়।ঘাসের মাথায় জমে থাকা মুক্তোর মতো একবিন্দু শিশিরের উপর যখন সূর্যের প্রথম কিরণ এসে পড়ে,তার মধ্যে জীবন আছে।দুপুর রোদে তপ্ত পিচ রাস্তার উপর যখন ঝরে পড়ে লাল কৃষ্ণচূড়া,তার মধ্যে জীবন আছে।শেষ বিকেলের কমলা রঙের রোদে উড়ে বেরানো ঘুড়িতেও আছে জীবন।রাতের হাওয়ায় মাধবীলতার মিষ্টি গন্ধে,ঝিঁঝির ডাকে জীবন আছে।জীবন ছড়িয়ে আছে মাঠে-ঘাটে,সর্বত্র,তাকেও খুঁজে পাওয়ার চোখ থাকা চাই।'

সাথে যোগ করে দিলাম রবীন্দ্রনাথ, নজরুল,জীবনানন্দের কয়েকটি কবিতার উদ্ধৃতি;যেগুলি আমার বেশ প্রিয়,তাই সুযোগ পেলেই যে করে হোক বক্তব্যের মাঝে ওগুলোকে ঢোকানো চাইই চাই।আর সবশেষে নতুন প্রজন্মের উদ্দেশে সুকান্তের থেকে ধার করা আমার কমন কোটেশনটাও দিতে ভুলিনি,

'....যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ
প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল,
এ বিশ্বকে এ শিশুর বাসযোগ্য ক'রে যাব আমি
নবজাতকের কাছে এ আমার দৃঢ় অঙ্গীকার।'

মুষ্টিবদ্ধ হাত আকাশে তুলে এই অঙ্গীকার করে যখন এই নাটকীয় বক্তব্য শেষ করলাম,দেখি মঞ্চের ওপারে ছাত্ররা একটা জ্বলজ্যান্ত কবিকে চোখের সামনে পেয়ে মুগ্ধদৃষ্টিতে চেয়ে আছে,তা দেখে মনে আত্মতৃপ্তির ভাব এল।যাক,বক্তব্যটা বেশ জমিয়ে দেওয়া গেছে।

এরপর সম্বর্ধনাও পেলাম। বহুমূল্য কিছু নয়,কিন্তু নিজের প্রাক্তন স্কুলে আমন্ত্রিত হয়ে এসে যাই মিলুক না কেন,তা অমূল্য।

অনুষ্ঠান শেষ হতে হতে সন্ধ্যে পার হয়ে গেল,তার উপর অনুষ্ঠান শেষ হতেই লোডশেডিং। স্কুলের বর্তমান হেডমাস্টার মশাই অনুরোধ করলেন বটে থেকে যাওয়ার জন্য। কিন্তু আমাকে আজই ফিরতে হবে। অগত্যা অন্ধকারেই স্টেশনের দিকে রওনা হলাম।

কিছুটা পথ পার হয়েছি,হঠাৎ মনে হল পিছনে কেউ আসছে। চারিদিক নিঃঝুম,কেমন গা-ছমছমে পরিবেশ,পিছনে মরচে ধরা সাইকেলের ক্যাচ্ ক্যাচ্ শব্দ। সাইকেলের শব্দে ভয় পাওয়ার কিছু ছিলনা,কিন্তু ভয় পেলাম। কারণ ঠিক এমনই একটা শব্দের সঙ্গে আমি ছেলেবেলায় পরিচিত ছিলাম।এমনই শব্দ করতে করতে অসুরবাবু সাইকেল চালিয়ে স্কুলে আসতেন। দূর থেকে ওই শব্দ শুনেই মাঠে খেলতে থাকা ছাত্রের দল ভয়ে ক্লাসরুমে ঢুকে যেত। শব্দটা এগিয়ে আসছে,আর আমার গলা শুকিয়ে আসছে।আজ ভরা সভায় ওঁর নামে বহু ক্ষোভ উগরে দিয়ে এসেছি। উনি যে বহুদিন আগেই মারা গেছেন,সে খবর আমার অজানা নয়। তবে কী! আমার উপর প্রতিশোধ নিতে উনিই আসছেন অমন ভূতুড়ে সাইকেলে আওয়াজ তুলে! পিছন থেকে ধরা গলায় কেউ ডাকছে, 'নির্ঝরবাবু,দাঁড়ান,' আরে!

আর তো সন্দেহের অবকাশ নেই,পড়া ধরার সময়ে এই বলেই তো ডাকতেন অসুরস্যার। কিন্তু না, হিসেব মিলছে না,বিজ্ঞান নিয়ে কারবার করা মানুষ কি মরে ভূত হতে পারে! ভূতটা যে বড্ড অবৈজ্ঞানিক ব্যাপার! ও বুঝেছি,সেই যে যন্ত্রটা আবিষ্কার করার নেশায় স্যার মেতেছিলেন,অথচ বেঁচে থাকতে তার প্রয়োগ করে যেতে পারেননি! নির্ঘাত আজ ওটার প্রয়োগ আমার উপরে ঘটাবেন উনি। জোরে জোরে পা চালাতে লাগলাম। কিন্তু সাইকেলের সঙ্গে পেরে উঠবো কেন!ধরা গলায় ডাকটা আরও নিকটবর্তী হয়ে এল।একবার ভয়ে ভয়ে পিছন ফিরে তাকালাম।আর তাকিয়ে যা দেখলাম,তাতে আমার মাথা ঘুরে যাওয়ার জোগাড়। চারিদিকের মিশমিশে কালো অন্ধকার ভেদ করে সাইকেলটা ছুটে আসছে আমার দিকে,আর সাইকেলের উপর যিনি বসে আছেন,অন্ধকারে তাঁকে দেখা যাচ্ছেনা,শুধু তাঁর পরণের সাদা জ্যাকেটটা চাঁদের ক্ষীণ আলোয় চোখে পড়ল,জ্যাকেটের সাথে লাগানো টুপিটা সামনের দিকে ঝুলছে।অর্থাৎ,এতদিন যা শুনেছি সব সত্যি! ভূতেরা উল্টো হয়ে চলতে পারে! ওই তো,উল্টো হয়ে কেমন সাইকেল চালিয়ে আসছেন অসুরস্যার! জ্যাকেটের হুড এদিকে মানে এদিকেই পিঠ দেখিয়ে, মুখখানি পিছনে ঘুরিয়ে অনায়াসে সাইকেল নিয়ে ছুটে আসছেন! এই দেখে আমার পা অবশ হয়ে এল,আর চলছে না, স্থবিরের মতো দাঁড়িয়ে পড়েছি। এই ভয়ানক মুহূর্তেও একবারের জন্য মাথায় উঁকি দিল একটা কৌতূহল,স্যার তো আগে শাল গায়ে দিতেন,সোয়েটার পরতেন।এখন কি ভূত হয়ে এমন আধুনিক ডিজাইনের হুডি পরাও শুরু করেছেন!ভূত সমাজও তাহলে ফ্যাশনের দিক থেকে নেহাত কম এগিয়ে নেই!তারপর মনকে বোঝাতে বসলাম ,ছিঃ নির্ঝর! ভূতেদের নিয়ে এমন রসিকতা করতে আছে!আরেকটু পর হয়তো তোমার মাথাটাও অমন উল্টে যাবে...

সাইকেলটা এসে থামল।উল্টো মানুষটা সাইকেল থেকে নেমে উল্টো হয়েই এগিয়ে এল।আমি পালাতেও পারছি না,মনে মনে ভাবছি অজ্ঞান হয়ে গেলে মন্দ হতোনা,ভয়ের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যেত। ভূতুড়ে কণ্ঠস্বর বলে উঠল, ‘কখন থেকে ডাকছি বলুন তো আপনাকে! আপনার থামার লক্ষণই নেই।’

আমি বললাম, ‘আপনিই তো থামিয়ে দিলেন স্যারক্ষ্ম,বললাম বটে,কিন্তু তা শোনা গেলনা,মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বেরোচ্ছে না আমার। অসুর স্যার মুণ্ডুখানা উল্টো রেখেই বলে চলেছেন,ক্ষ্মএকেই ঠাণ্ডায় গলাটা ধরে গেছে।এই গলা নিয়েও চেঁচিয়ে চলেছি।’

ভূতেদেরও ঠাণ্ডা লাগে! মরেও শান্তি নেই দেখছি!

# তিতলির স্বপ্নপূরণ

বর্ণালী সেন
চতুর্থ সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ

ছোট্ট মেয়ে তিতলি ক্লাস সিক্সে পড়ে। পড়াশুনায় অত্যন্ত মনযোগী। তার মা-বাবার সাথে তিতলি একটি ছোট্ট গ্রামে থাকে এবং সেখানকার স্কুলে পড়াশোনা করে। তিতলিদের আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তার বাবা ক্ষেত, খামারে কাজ করত এবং মা সংসারের দেখাশোনা করত। ফলে তিতলির পড়াশোনার খরচ বহন করাটা তার মা-বাবার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠেছিল। তিতলি তার বাবা-মায়ের একমাত্র সন্তান। তাই সমস্ত আশা, ভরসা তাদের তিতলির ওপরেই। ছোটো থেকেই তিতলির স্বপ্ন ছিল যে সে ডাক্তার হবে এবং গ্রামের সকল মানুষদের বিনামূল্যে চিকিৎসা করবে এবং গ্রামের সকলের পাশে দাড়াবে। কিন্তু তিতলির এই স্বপ্ন কি পূরন হবে? ধীরে ধীরে তিতলিদের সংসারে টান পড়তে লাগলো এবং তার মধ্যেই তিতলির বাবার ক্যন্সার ছিল এবং টাকার অভাবে চিকিৎসা না করতে পারার জন্য সংসারের মায়া ত্যাগ করে পরলোক গমন করেন। তার বাবার মৃত্যুর সংসারের সমস্ত দায়িত্বের ভার তিতলির মায়ের কাছে এসে পড়ল। তার মা অত্যন্ত কষ্ট করে হলেও তিতলির পড়াশোনার সব দায়িত্ব পালন করতো। ধীরে ধীরে তিতলি বড়ো হতে লাগলো। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে তিতলি খুব ভালো ফলাফল করেছিল। তিতলি শুধুমাত্র পড়াশোনাতেই ভালো ছিল তা নয়, পড়াশোনার পাশাপাশি তিতলি খুব ভালো গান করত। তিতলির বাড়িতে তার একটি প্রিয় বাগান ছিল। তিতলির যখনই ওর বাবার কথা মনে পড়ে মন খারাপ করতো তখনই সে বাগানে যেত এবং গান করতো। বলতে গেলে সেই বাগানটি ছিল তার বন্ধু। মাঝে মাঝে বাগানে বই নিয়ে যেত এবং পড়াশোনা করত। তিতলি তার মাকেও সাহায্য করতো।

গ্রামের সবাই তিতলিকে নিয়ে গর্ববোধ করত। বলতে গেলে তিতলি সবার প্রিয় ছিল। এদিকে তিতলির মায়ের বয়স বাড়তে লাগলো সাথে চিন্তাও করছিল যে এত টাকা কোথায় পাবে সে? তিতলি কি আর ডাক্তার হতে পারবে না? অনেক প্রশ্ন তিতলির মানে ঘুরপাক খেতে লাগলো। কী করবে তিতলি ভেবে পাচ্ছিল না। অবশেষে তিতলি এবং তার মা ঠিক করল যে গ্রামের প্রত্যেক বাড়ি গিয়ে আর্থিক সাহায্য চাইতো। এর ফলে অনেকের অনেকরকম কথাও শুনতে হয়েছিল তাদের। কিন্তু উপায় নেই স্বপ্ন পূরণ করতে চাইলে অনেক বাধা বিপত্তি জীবনে আসবে সেগুলোকে পরোয়া না করে নিজেকে স্বপ্ন পূরণের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তিতলিও ঠিক এমনটাই করেছিল। অবশেষে অনেক বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ পায়। পড়াশুনার জন্য তাকে বাহিরে যেতে হয়েছিল। যাওয়ার আগে সে তার মাকে বলে যায় যে সে একবারে ডাক্তার হয়েই ফিরবে, এবং ফিরে এসে তার মায়ের পূরণ করবে। নিজের স্বপ্ন তো পূরণ হলো এবার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করা বাকি।

অবশেষে এল সেই দিনটি কয়েকবছর পর তিতলি নিজের গ্রামে ফিরছে। এই কয়েক বছরে তিতলি শুধু তার মায়ের কথাই ভেবেছে। গ্রামে ফিরে দেখলো যে তার ছোটবেলার গ্রাম খানিকটা পরিবর্তন হয়েছে। বাড়িঘর গুলো আগের মতো নেই। তিতলি যেই মাঠে ছোটোবেলা খেলতো সেখানে অনেক দোকান সারি সারি হয়ে বসেছে, সেই পুকুর যখনে তিতলি রোজ যেত সেটি কচুরিপানায় ভরে গিয়েছে, বেলগাছটি এখন আর নেই, এত কিছু দেখতে গিয়ে তিতলি বেশ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল। হঠাৎ তিতলির চোখ পড়লো ওই দূরে রাস্তায় একজন মহিলা সাদা শাড়ি পড়ে দাঁড়িয়ে আছে। তাহলে কি তিতলির মা? কিছু দূর যেতেই মুখটা তিতলির কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, মা...মা... বলে তিতলি জড়িয়ে ধরলো। তিতলির দু-ফোঁটা চোখের জল গরিয়ে পড়লো সাথে তার মায়েরও। অনেক বাধা বিপত্তির মধ্যে দিয়ে তিতলির স্বপ্ন পূরন করতে পারার আনন্দ এবং এতদিন পর মাকে জড়িয়ে ধরার আনন্দ তার ফলেই এই চোখের জল। অর্থাৎ তিতলি থেকে ড.তিতলি হওয়ার জন্য তাকে এবং তার মাকে অনেক কঠিন পরিশ্রম করতে হয়েছে। অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

তিতলি তার বাবাকে অনেক বেশি মিস করে কারণ তার বাবা থাকলে তার বাবাও অত্যন্ত খুশি হতেন এবং গ্রামের প্রতিটি মানুষের চিকিৎসা তিনি বিনামূল্যে করেন। তিতলির ছোটবেলার স্বপ্ন অবশেষে পূরণ হল। সেই ছোট্ট তিতলি এখন অনেক বড়ো ডাক্তার।

# নপুংসক

অঙ্কিতা সেন
চতুর্থ সেমিস্টার, বাংলা বিভাগ

বিছানায় হরেন্দ্রের নিথর দেহটি পড়ে আছে। সেই দেহটিকে জড়িয়ে ধরে বসন্তলিকা উচ্চৈস্বরে কেঁদে চলেছে। এ পৃথিবীতে যদি বসন্তলিকার আপন কেউ থেকে থাকে,তবে সে হরেন্দ্র।একবছর যাবৎ ক্যান্সারে আক্রান্ত থেকে আজ সকালে হরেন্দ্র শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছে।

হরেন্দ্র একজন নপুংসক,কাজেই ছোটো থেকেই তার জীবনে দুঃখ-কষ্টের অন্তঃ ছিল না। হরেন্দ্র যে বস্তিতে থাকতো,সেই বস্তিরই মেয়ে বসন্তলিকা।শৈশবে বস্তির সকলে যখন খেলতো,তখন হরেন্দ্রের খুব ইচ্ছে করতো তাদের সাথে খেলতে।কিন্তু সে নপুংসক হওয়ায় তাকে কেউই খেলতে নিত না,বরং তাকে নিয়ে হাসাহাসি করতো।এমতাবস্থায় বসন্তলিকা হরেন্দ্রের সাথে বন্ধুত্ব করে এবং সেই ছিল তার একমাত্র বন্ধু। বসন্তলিকা খুব ছোটো থাকতেই তার বাবা-মা মারা যান।তাকে ছোটো থেকে আগলে রেখেছেন তার দিদিমা রন্ধ্রাময়ী দাসী। তিনি হরেন্দ্রকেও অত্যন্ত স্নেহ করতেন,কাজেই তাদের দুজনের বন্ধুত্ব নিয়ে রন্ধ্রাময়ী কখনোই কোনো আপত্তি করেননি। তবে তাদের বন্ধুত্ব নিয়ে রন্ধ্রাময়ীকে অনেক খারাপ কথাও শুনতে হয়েছিল।

বসন্তলিকা যখন দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়ে,তখন রন্ধ্রাময়ী মারা যান।সেই সময় থেকেই বসন্তলিকার সকল দায়িত্ব হরেন্দ্র নিজের কাঁধে তুলে নেয়।আজ বসন্তলিকা একজন মস্ত বড়ো ডাক্তার। আসলে অনেক ছোটো থেকেই হরেন্দ্রের ডাক্তার হওয়ার বড়ো ইচ্ছে ছিল।কিন্তু নপুংসক হওয়ায় তার এই স্বপ্ন কখনোই পূর্ণতা পায়নি।তাই সে বসন্তলিকার মধ্য দিয়ে তার ইচ্ছে পূর্ণ করেছিল।

হরেন্দ্রের যখন ক্যান্সার ধরা পড়ে,তখন থেকে বসন্তলিকা অনেক চেষ্টা করেছিল তাকে বাঁচানোর।এই একবছর বসন্তলিকা দিন-রাত হরেন্দ্রের সেবা করে গেছে,উপায় খুঁজেছে কীভাবে হরেন্দ্রকে বাঁচানো যায়। কিন্তু অবশেষে এত চেষ্টা করেও বসন্তলিকা হরেন্দ্রকে বাঁচাতে পারেনি।সবচেয়ে অবাক করা বিষয় হল,হরেন্দ্রের মৃত্যুসংবাদ শুনেও বস্তির কেউ তাকে দেখতে আসেনি।শেষ পর্যন্ত তাদের শ্রেণীর কিছু লোককে ডেকে হরেন্দ্রের দাহকাজ সম্পন্ন হয়।

আজ হরেন্দ্র মারা যাওয়ার অনেক বছর কেটে গেছে।বসন্তলিকা এখন আর সেই বস্তিতে থাকেনা।সে শহরে একটি ফ্ল্যাট কিনে সেখানে একাই থাকে।তার সাথে গল্প করতে প্রত্যেক রবিবার অনেক নপুংসকেরা আসে। তাদেরকে সে ভালোবেসে খাওয়ায়,আদর-যত্ন করে। তারাও বসন্তলিকাকে অত্যন্ত স্নেহ করে,ভালোবাসে।

আসলে সমাজ যদি কখনো এই নপুংসকদের একজন স্বাভাবিক মানুষের দৃষ্টিতে দেখতো,তাহলে হয়তো হরেন্দ্রের ছোটোবেলাটাও অনেক আনন্দে কাটতে পারতো।তার পিতা-মাতা সমাজের ভয়ে তাকে ছেড়ে চলে যেত না।তার ডাক্তার হওয়ার স্বপ্নটাও একদিন পূর্ণতা পেতো। এখনো হরেন্দ্রের মতো মানুষেরা এই পৃথিবীর চোখে যোগ্য নয়,কিংবা আসলে হয়তো মনুষ্যত্বহীন এই পৃথিবী হরেন্দ্রের মতো মানুষের যোগ্য নয়।তাই তার মৃত্যুতে বসন্তলিকা কষ্ট পেয়েছিল ঠিকই, কিন্তু এই ভেবে সান্ত্বনা পায় যে,হরেন্দ্র যেখানে গেছে সেখানে নিশ্চয়ই নারী-পুরুষের মাপকাঠিতে মাপা হয়না কাউকে,সেখানে সবাই মানুষ,শুধুই মানুষ।

# ফিরে দেখা

প্রিয়াংশু দত্ত
ষষ্ঠ সেমিস্টার, ইতিহাস বিভাগ

আজ ডাবলিন শহরে এক বৃষ্টিস্নান ও শীতল সকালের উদয় হয়েছে জানালার পাশে বসে টেবিলে ল্যাপটপে কাজ করতে করতে গরম কফি কাপে চুমুক দেওয়ার সাথেই এই শীতল নিস্তেজ সকালের নিস্তব্ধতাকে উপলব্ধি করতে বেশ ভালোই লাগছিল। রাস্তায় যানবাহনের কোলাহলও যেন তুলনামূলক কম। গোটা শহরটাই যেন চার দেওয়ালের ভেতরে বসে রয়েছে ও এই অঝরে ধারা বর্ষণের থামবার অপেক্ষায় অপেক্ষারত ও এত সব কথার মধ্যে নিজের পরিচয়টাই যে দিতে ভুলে গিয়েছিলাম। আমার নাম অনুভব সিনহা, ডাবলিন শহরের এক বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত ও কর্মসূত্রে শহরের প্রায় প্রানকেন্দ্রে একটি বড় আপার্টমেন্টের ছোটো ফ্ল্যাটে আমার বাস। জন্মসূত্রে ভারতীয় হলেও দেশ ছেড়েছি বহুকাল ও বাবা-মা গত হওয়ার পর থেকেই এই শহরে পাকাপাকি বসবাস। এতসব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ লক্ষ্য করলাম রাস্তা দিয়ে কয়েকজন যুবক যুবতীরা বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতেই আপন মনে রাস্তা দিয়ে কখনও হেটে বা কখনও লাফাতে লাফাতে নিজেরদের মধ্যে খুনসুটিতে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। তাদের এই উচ্ছ্বাস যেন এই বৃষ্টি ও শীতকেও দমিয়ে দিয়েছে। তাদের দেখে মেনে হল তারা সদ্য যৌবনে পা রাখা কলেজের ছাত্র ছাত্রী। তারা মুক্ত, তারা স্বাধীন, তাদের আনন্দের সামনে যেন আজ সব সমস্যাই ফিকে হয়ে উঠেছে। আজ নিজের কলেজ জীবনকেও যেন বার বার মনে পড়তে লাগলো। মন যেন স্মৃতিচারনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সত্যিই সেটা একটা সময় ছিল বটে। আজ ও মনে পড়ে কলেজের সেই প্রথম দিন যেদিন প্রায় ৩০ মিনিট দেরি করে ক্লাসে ঢুকেছিলাম ও স্যারের কাছে বকা শুনতে হয়েছিল। অনেক অচেনা মুখের ভিড়ে যেন নিজেকে একটু একা মনে হয়েছিল। কিন্তু কয়েকদিন যেতে না যেতেই প্রায় সকলকেই হয়ে উঠলো পরিচিত ও যেন নিজের অনেক কাছের। বন্ধুদের সাথে ক্লাস বাঙ্ক, সিনেমা দেখা, আড্ডা দেওয়া যেন হয়ে উঠলো জীবনের অংশ। কলেজে উপস্থিতির জন্য বকুনি, বন্ধুদের থেকে নোট চেয়ে পড়া এইসব যেন ছিল প্রতিদিনের সঙ্গী। বন্ধুদের জন্মদিন থেকে শুরু করে তাদের মন খারাপ অবধি তাদের সঙ্গে সবসময় থাকাটাই যেন হয়ে উঠেছিল পরম কর্তব্য, তখন না ছিল জীবনে এগিয়ে জাবার ইঁদুর দৌড়ে অংশ নেবার ইচ্ছে না ছিল অর্থের পেছনে ছুটে নেবার লোভ। এসব স্মৃতি মনে করতে করতেই ল্যাপটপে থাকা পুরনো ছবি গুলিকে দেখতে দেখতে কখন যে ঠোটের কোনায় হাসি চলে এসেছে বুঝতেই পারিনি। কিন্তু ভালো সময় বেশি দিন থাকে না।

দেখতে দেখতে কলেজে শেষ হয়ে গেলো। বিগত তিন বছরের সকল আনন্দের মুহুর্তগুলো যেন বিলীন হয়ে যেতে লাগলো। কলেজের শেষদিনে আজকের মতোই ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়ছিল, কলেজের দিকে শেষকারের মতো তাকিয়ে মনে একটাই প্রশ্ন এসেছিল সত্যিই কি সব শেষ? এই চিরপরিচিতি অভ্যাস বদলের সময় কি সত্যিই আগত হয়েছে? সব চেনা মুখগুলো যেন দিন দিন হারিয়ে যেতে থাকলো, চোখে কান্না ও মনে স্মৃতি নিয়েই বিদায় ঘটলো কলেজ জীবন নামক এক সোনালি অধ্যায়ের, সেই সময় হয়তো পকেটে পর্যাপ্ত অর্থ ছিলনা। সত্যিই তো সেই সোনালী দিনগুলির দিকে ফিরে দেখা গেলেও ফিরে যাওয়া আর হয় না। এতসব ভাবনার মধ্যেই যেন এই বৃষ্টির ফোটা যেন মনকে আরও বেদনাতুর করে তোলে।

# Deathless

**Ayanaditya Roy**
**Fourth Semester, English Department**

The child ran, his shadow growing taller and taller and the hazy figure becoming a part of the sunset silhouette. The bird imitator flapping his hands while gurgling motor like sound arrived to the once eden of greenery and now turned embodiment of sin itself where each plant had dried to a state where they resembled human hands spewed out of the earth seeking for but just a drop of water.The branches were so twisted that someone might mistake them for hanging heads of a legion of hungry whelps. The thousands of leaves scattered throughout the plain now resembled shoes of different shapes and sizes. Yet the child wearing red framed sunglasses which was bought from the urban fare could see none of these.

Beyond the garden stood a house, the destination of the boy. The boy tried to smell for nostalgia. But Alas! the fragrance of wet soil is now but a distant memory. The garden was barren from goodness and the serpent like twigs made him feel anxious. The courtyard's atmosphere feels hollow, the once welcoming arm chair has gone missing.

Anxious mind leads to fear, thus forcing the boy to take off his blindfold.

The boy opened the door which made a wail as if awakened from its slumber to demise. The unwelcoming dark corridor reluctantly welcomed him with nothing to look upon, the carelessly rolling rusty lantern showed him the way to the end of the corridor with its light slowly perishing. The wooden floor made cracking noises which increased with every step as the boy wanted to make his presence loud and clear. He stumbled across a door that he vividly remembered and peeked inside to see what's stored within.

An old woman sitting at the edge of a bed with her back leaning upon the wall, her eyes seemed to trying to reminiscent the contents of her confinement room but the small light through the door cannot unveil every secret present within the boundary of the world. Soft music playing in a gramophone could be heard along with an urgency of down pour occurring in some distant (which is actually a sound created by the gramophone).

“Grandma”, The boy cried.

His grandma turned to look at him and smiled, “Hello Dear. Where are your mother and father?”

The boy froze, the eye of the lady numbed him with dread. Soon darkness would decend and as the light began to flicker, the boy prayed for the truth in front of him to extinguish with the fire …But the flames were still burning brighter than ever.

# Farewell Blues

**Nandini Roy**
**Sixth Semester, English Department**

A Sunday afternoon in the season of winter. A fairly tall girl in her green sweatshirt and black pant, waiting for 45 minutes for the bus sitting on a vacant bench beside a shop.....
"Buses are hardly available on Sundays, dear. Why don't you go tomorrow?", asked the shop owner.
"Have an interview at 9 AM. I don't have a choice", she replied followed by a deep breath.

The question took her back to the previous day in her native village her grandma had asked if she could return to her house the next day. But she knew some questions are not made for answers. "I will come visit you soon", she said with a curl on her lips. These flashbacks keep still coming back to her head. That was the Laxmi Puja. She was visiting her grandparents almost after 2 years, after all her exams were over and her mother's eye operation; And it has been 15 years since she moved to the town with her parents. The green fields filled with potatoes, peas, tomatoes; the banyan tree with its long descending roots; the garden of betel nut trees; her primary school; the river which once gulped the fields but now stays silently dead; temples; scattered houses; the cheap looting; salon; the store where once the telephone booth used to be; bush and bamboo trees beside the road and their canopy, all reminded her of those old childhood days. But their came that feeling. The feeling which reminds you of things you cherished like pearls on a string. Time cuts the knot. They scatter across the floor rolling in the dark corners, never to be found again.Then a void fills the heart. At a certain time, the affiliation slips into being nothing but some intimate strangers. It feels as if you're not welcomed wholeheartedly.

What's the use of moving elsewhere and wasting money? Those who are determined can make anything happen if they want, said one of her distant aunts to another.
Didi, everyone wants to prosper in their life. They think that's how it can happen.
Leaving the olds deserted? Does that count?
Now they too have their busy life, at least they visit
Once a year! At least have some sense of obligation!
You get opportunities if you go out.
What's the use of opportunities if you are still unable to grasp one.
She still has time left.
Time…, her? She can't even financially help her mother in her surgery. Don't the young people here live their life?
That's because she's still studying.
People study because they are scared, they would end up being nothing.

Were those words addressed to her knowing she was there? She did not know. Thousand threads of tangled questions dangling from the sceptical eyes blended into greyish dense smoke curling and rising to the sky making her feel suffocated. She wondered whether it is the failure of belonging or the guilt of abandonment. She got lost ruminating and reflecting over and over the sea of her consciousness. The cold night breeze coming through the window kept brushing the thoughts all over her face. Noise in the background weighid down the ears into something obscure. Winks failed to take the account of time.
"ANYONE TO GET OFF AT __?"
A sudden voice hit her.
"YESS!... COMING!" and she got up from her seat to collect her things. Piercing through the overly crowded bus, she finally managed to get off. Under the desolate sombre sky, she kept on walking past the street lights leaving a dark long shadow behind her.

# A Whisper Of Justice

**Sohini Bal**
**Sixth Semester, English Department**

The last bus from Siliguri to Chamurchi had just disappeared in the smog. Bitan with his heavy backpack was standing all alone. Some dogs were barking at the top of their voices. The chilling wind was a declaration of the coldest night which was cutting through his skin. With hardly any hope , Bitan started to walk through the fog shrouded tea garden. He had to walk for 20 minutes to reach his bungalow. He was the manager of Haldipara Tea Estate.
Bitan had never seen the tea garden during cold winter nights. It had only been 6 months since he started working here as the manager. For the first time, he was living in a place like this. He had seen tea gardens before this, when he was on family trip. He used to love tea gardens. The news of the struggles of native working there used to make him sad. That is why he never wanted to live in such a place. The rising unemployment and the sudden job opportunity is the reason that he was there. It was rumoured that the previous manager left the job, because of a scary experience.

Bitan wasn't really afraid of ghosts or spirits and was confident in his belief that there is nothing called the supernatural. The chief cause of worry in a tea garden is the threat of being mowed down by wild elephants, who had started frequenting this place of late. With all these dark thoughts, Bitan was struggling with his heavy bag to reach the bungalow. With every passing minute the wind seemed colder, the bag seemed heavier than before.

He walked for 10 minutes like that, when out of nowhere a dog started barking in a deafening manner. Bitan was taken by surprise but he seemed to gather himself. The dog's continuous barking reminded him of his deepest fears. He started praying that the dogs shouldn't be barking because of the presence of elephants. Suddenly he caught sight of a black shadow walking towards him. Bitan stopped and asked 'Who is it! Is it Daran? Can you please carry my bags? I'm carrying it for the last ten minutes now and it's so heavy that I can't bear it for ten more minutes!' He realised that Daran is not answering him and he again repeated his query in hindi. The shadow replied, 'No babu, I'm not Daran. You're mistaking me with someone else. I am Ratan. You don't know me but I know you. I used to live here. Six months back, that scroundel manager got me murdered just because I demanded justice for my people!' The heavy bag dropped from his hand and Bitan was stopped in his tracks. The shadow keptsaying, "I'm here to complain to you about that jerk. After murdering me he left this tea garden with the rumour of ghosts. You know what babu! If I was really the son of my mother I should've broken his neck! But the fear of superiors is still in my heart! I just asked for the justice for the women here who were repeatedly getting molested and tortured by that jerk, and for the men who used to work here with a very little payment and never-ending torture. The former manager even ordered the children to work here so that he can destroy our future. I was a bit educated among them, I suffered and read about the tortures and struggles that we've gone through all our life, so I asked for justice. Was it too much to ask? Answer me babu! Was it?' With surprised eyes and trembling voice, Bitan said 'No' . The shadow continued, ' You may have already read about what had happened to us during the lockdown.We were suffering from lack of jobs, money and most importantly, lack of food and treatment. But after all this, when we again got our jobs back, we were ecstatic, we celebrated with the new manager but we didn't know that he came here with infinite hatred for us. He took us for granted, he used us as commodity. Answer me babu,was asking for justice really too much! Should not we speak of our problems and ask for solutions?' Bitan says, 'Yes, you should!'

Shadow kept saying, 'If yes, then listen to me Babu! I fear as well as hate the superiors, but you seem to be good than the others. So listen carefully. You've to do something with the payments of these people. You've to do something for their betterment. You also have to case a file about the murder of Ratan Munda. At the very entrance of the forest, if police search properly, they'll discover my grave. Just beside my body you'll find a wristband with the name Ratan on it. That'll be the identification mark on my body. I know you'll do it or else this time I will not fear breaking your nose, remember that! Saying these words, the shadow passed him, stopped, and again said, "Give me your bag; I'll help you to cover this ten-minute road."

When Bitan opened his eyes, he saw the sunlight streaming through the leaves of the trees. An old widow was constantly shaking his body while saying, "Babu!" Hey Babu, open your eyes! What happened to you? Why are you lying here? You'll catch a cold, Babu; for god's sake, please wake up!" The only thing thing Bitan remembered were the last words of Ratan. He knew what he had to do. He'll get these people the justice that they deserve, that Ratan spoke of, for what he got killed. He'll give justice to all..and to Ratan too.

**Mainak Sinha**
**First Semester,**
**English Department**

# চলো যাই কার্শিয়াং

অঙ্কিতা বিশ্বাস
অধ্যাপিকা ও প্রাক্তন ছাত্রী, উদ্ভিদবিদ্যা বিভাগ

পুজোর ছুটির ঘন্টা বাজতেই হইইই রব, কোথায় যাবো কোথায় যাবো। সে এক দীর্ঘ গবেষণা আর প্ল্যানিং এর বিষয় পুজোর ছুটির দিন কয়েক আগে থেকেই। অবশেষে ঠিক হল কাছাকাছি কোথাও একটা ঘুরে আসবো। আমাদের এবারের গন্তব্য ''কার্শিয়াং''। জলপাইগুড়ি থেকে ৯০ কিমি আর শিলিগুড়ি থেকে ৪৫ কিমির দূরত্বে অবস্থিত কার্শিয়াং শহর। হোমস্টের বুকিং অনুযায়ী আমাদের যাওয়ার দিনক্ষণ ঠিক করা হল। কিন্তু

বাধ সাধল বৃষ্টি। ফেসবুকের মাধ্যমে জানতে পারলাম পাহাড়ে তুমুল বৃষ্টি হচ্ছে আর বিভিন্ন জায়গার ধস নেমেছে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কালিম্পং, দার্জিলিং এ প্রবল বৃষ্টিপাতের জন্য আগাম রেড ওয়ার্নিং জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর। এদিকে যাওয়ার দিন চলে এলো। আগের দিন সারাদিনব্যাপী বৃষ্টি দেখে মনটা খারাপ হয়ে গেল। যাই হোক ব্যাগপত্র হাদিয়ে ঘুমোতে যাওয়ার আগে ওয়েদার রিপোর্ট চেক করে দেখলাম পরের দুটো দিন বৃষ্টি হবে। কি আর করা যাবে, এবারে না হয় পাহাড়ে দিয়ে বৃষ্টি উপভোগ করলাম। এই বনে মনকে খানিকটা শান্তনা দেওয়া আর কি।

পরের দিন সকালে ঘুম ভাঙতেই ঘরের বাইরে বেরিয়ে দেখি বৃষ্টি নেই, তবে মেঘলা আকাশ। সকাল সাতটায় জলপাইগুড়ি থেকে বাসে রওনা দিলাম শিলিগুড়ির উদ্দেশ্যে। শিলিগুড়ি পোঁছে সেখান থেকে পেয়ার কারে কার্শিয়াং। পৌঁছাতে সময় লেগেছে প্রায় দেড় ঘন্টার মতো। কার্শিয়াং পৌঁছাতেই শুরু হলো বৃষ্টি। আমাদের থাকবার জায়গাটি দিল কারবিয়া টি গার্ডেনে Amairah Homestay, কার্শিয়াং টয়ট্রেন স্টেশনের পাশের রাস্তা দিয়ে নীচের দিকে নেমে যেতে হয়, হাঁটা পথে ৫-৭ মিনিট। হোমস্টেতে পৌঁছাতেই নিমেশ জী আমাদের সাদর অভ্যর্থনা না। আমাদের আগে থেকেই বলা দিন কোণার দিকের ভিউ রুমখানা আমাদের চাই। রুম থেকে কার্শিয়াং শহর ও কাঞ্চনজঙ্গার অপূর্ব ভিউ পাওয়া যায়। বাইরে তখন বৃষ্টি হয়েই চলেছে। একটু ফ্রেশ হয়ে লাঞ্চ সেরে নিলাম। লাঞ্চে ছিল ভাত, ডাল, স্যালাড, পাঁপড়, ফুলকপির তরকারি, চিকেন কষা, আর তেঁতুলের আচার। জনিয়ে পেটপুজো সেরে মুষ্টি বন্ধ হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে মেঘেদের আনাগোনা আর বৃষ্টি ভেজা পাহাড়ের সৌন্দর্য উপভোগ করলাম। বৃষ্টি কমতেই বেড়িয়ে পড়লাম চারপাশটা ঘুরে দেখতে। চা বাগানের আঁকাবাঁকা পথ ধরে এগিয়ে চললাম। পাহাড়ে তো ঝুপ করে সন্ধ্যা নামে, তাই বিকেল বিকেল হোমস্টেতে ফিরে এলাম। বৃষ্টি হওয়ায় মেঘ গুলো সরে গিয়ে দূরের পাহাড় আর চা বাগানের মধ্যে দিয়ে চলে যাওয়া আঁকাবাঁকা পথ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছিল রুমের বারান্দা থেকে। দূরে সূর্যাস্তের শেষ রক্তিম আভাটুকু মিলিয়ে যেতে দেখলাম। এরই মধ্যে এক এক করে পাহাড়ের বুকে জ্বলে উঠতে থাকে হাজার হাজার আলোর বিন্দু। কার্শিয়াং শহরটাকে সত্যি কোনো স্বপ্ননগরীর থেকে কম কিছু মনে হচ্ছিল না। চা এর কাপ হাতে ঘরে বিছানায় বসেই সন্ধেটা কাটিয়ে দেওয়া যায় নিঃসন্দেহে। গরম গরম চিকেন মোমো দিয়ে সন্ধের টিফিন সারলাম। আমার পুরো সন্ধেটাই কেটে খেল রুমের বারান্দায় বসে। ডিনারের জন্য ডাক পড়ল সাড়ে নয়টা নাগাদ। ডিনারে ছিল ভাত, ডাল, আল ভাজা, মুচমুচে বেগুনি,ডিম কষা, আর শেষ পাতে মিষ্টি। বিছানায় শুয়ে পাহাড়ের বুকের আলো গুলো দেখতে দেখতে সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম ঠিক খেয়াল নেই। পরের দিন ঘুম ভেঙেছিল ঠিক ভোর পাঁচটায়। বিছানা ছেড়ে উঠে বারান্দায় দাঁড়াতেই চোখে পড়ল মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে শ্বেতশুভ্র কাননা। রাতের অন্ধকার ভেদ করে ভোরের প্রথম আলোয় কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষারাবৃত শৃঙ্গ গুলি একটু একটু করে আলোকিত হচ্ছে। সূর্যোদয় হতেই দূরে কাঞ্চনজঙ্ঘাকে দেখে মনে হচ্ছিল ঠিক যেন এক টুকরো সোনা। সকালের চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে সূর্যোদয়ও দেখা হয়ে গেল। আমাদের সেদিনের আরেকটি থাকবার জায়গা ছিল ডাউহিলের কাছাকাছি পাইনে ঘেরা ফরেস্টের মাঝখানে Sylvan Homestay, যেটা মূলত St. Mary's Hill এ রয়েছে। স্যান্ডউইচ, ফ্রায়েড এগ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে তৈরি হয়ে নিলাম , যেতে হবে পরের গন্তব্যে।

Sylvan Homestay-র owner রাজু ভাইয়া নিজেই এসেছিলেন Amairah Homestay থেকে আমাদের নিয়ে যেতে। অবশেষে করবিয়া টি গার্ডেন আর Amairah Homestay কে বিদায় জানিয়ে আমরা রওনা দিলাম। Sylvan Homestay এর দিকে। হঠাৎ করেই কোথা থেকে মেঘেরা এসে চারপাশটা ঘিরে ধরলো, সাথে হালকা বৃষ্টি। Sylvan Homestay একদম একটা offbeat focation এ অবস্থিত St. Mary's Hill এ। পাইন ফরেস্টের মাঝখানে ওই একটাই হোমস্টে। যারা একটু অ্যাডভেঞ্চার পছন্দ করে তাদের এক্সপ্লোর করার জন্য এটি একটি পারফেক্ট ডেস্টিনেশন। ডাউহিলের কাছাকাছি গা ছমছমে পরিবেশে এক টুকরো স্বর্গ বৈকি, এখানে না এলে হয়তো বোঝা যাবে না। এখান থেকে পায়ে হেঁটে মিনিট ১৫-২০ এর পথে পৌঁছে যাওয়া যায় ডাউহিল। পিচের পাকা রাস্তার পাশ দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে একটা পাথুরে রাস্তা, সেই পথ ধরে আমাদের গাড়ি এগিয়ে চললো। হোমস্টে যাওয়ার পথেই দেখে নিলাম Eastern forest rangers college, যেখানে রজনীকান্ত অভিনীত বিখ্যাত সিনেমা "Potta" এর শুটিং হয়েছিল। গাড়ি থেকে নেমে পায়ে হেঁটে খানিকটা নীচে নামলেই সুসজ্জিত একখানা হোমস্টে। আমরা পৌঁছাতেই রাজু ভাইয়া আর ওনার স্ত্রী আমাদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন। হোমস্টের নীচের হোন রাজু ভাইয়া ওনার পরিবার নিয়ে থাকেন আর ওপরের ফ্লোরটি হোমস্টে হিসেবে ব্যবহার করেন। বাইরে তখনো মেয়েদের আনাগোনা,সূর্যিমামারও দেখা নেই। এক কাপ চা হাতে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। যতদূর চোখ যায় শুধুই পাইনের জঙ্গল, কান পাতলে শোনা যায় বিভিন্ন সব পাখির আওয়াজ। রাজু ভাইয়া বলছিলেন সেখানে নাকি বার্কিং ডিয়ার, পরকুপাইন, লেপার্ডেরও দেখা মেলে কখনো কখনো। দুপুরের নাম সেরে নিলাম্ধ গরম গরম ভাত, ডাল, নিংড়ো শাক (আমরা যাকে বলি ঢেঁকি শাক), আলুভাজা, চিকেন কষা আর পাঁপড় দিয়ে।

লাঞ্চের পর আশেপাশের জায়গাগুলো পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখলাম যেমন St. Mary's Hill অবস্থিত St. Mary's Grotto, Catholic church, Catholic graveyard চার্চে তখন প্রার্থনা চলছিল। চার্চের সামনে দাঁড়িয়ে সুদূর প্রসারিত মেঘেদের রাজ্য সঙ্গে একটা সুন্দর সূর্যাস্ত সত্যি মন ভরিয়ে দিল। গুটি গুটি পায়ে জঙ্গলের পথ ধরে সূর্যের আলো মিলিয়ে যাওয়ার আগেই হোমস্টেতে ফিরে এলাম। আরেকটা জিনিস যেটা বড্ড বেশি বিব্রত করেছে সেটা হল জোঁক। বৃষ্টি ভেজা পাহাড়ে পাইনের জঙ্গলে এই এক সমস্যা। সাথে করে লবণের পুঁটলি নিয়ে পথ চলতে হয়। সন্ধ্যা নামতেই চারিদিক ছেয়ে গেল নিকষ কালো অন্ধকারে। দূরে পাহাড়ের বুকে জ্বলে উঠলো অজস্র আলো, চারদিকে থেকে ভেসে আসতে লাগলো ঝিঁঝিঁ পোকার শব্দ। ঠান্ডাটাও বেশ জাকিয়ে ধরলো। গা দমদমে এক পরিবেশ। হোমস্টেতে আমরা চারজন ছাড়া আর কোনো গেস্ট ছিল না সেদিন। সন্ধ্যা নামার পর দুজন এসেছিলেন আগে বুকিং করা ছিল হয়তো কিন্তু ওমন লোকেশন দেখে ওনারা ফিরে গেছেন। যাইহোক, চায়ের কাপ হাতে বারান্দায় বসে রইলাম বেশ কিছুক্ষণ আর সাথে চললো আড্ডা। গল্পের বিষয় হল গরুবাথানের হোয়াইট হাউস, কালিম্পং এর মরগ্যান হাউস, ডাউহিলের ভিক্টোরিয়া বয়েজ স্কু আর সন্ধের পর লাটাগুড়ি ফরেস্ট। আড্ডার মাঝেই এসে পড়ল সন্ধের টিফিন গরম গরম চিকেন মোমো।

আহ। সত্যি পাহাড়ের মোমোর স্বাদ আলাদাই। পাইনে মোড়া জঙ্গলের মাঝে স্বভাবতই ঠান্ডা একটু বেশি। তাই ঘরে বসেই আবার শুরু হলো আড্ডা। মাঝে মাঝে ঘরের দরজা ঠেলে উকি দিয়ে যাচ্ছিল ফুচে আর কিট্টো, রাজু ভাইয়ার পোষ্য দুটো বিড়াল। এছাড়াও পোষ্য একটি কুকুর ও রয়েছে নাম মাফিন ডিনারে সেদিন ছিল ভাত, ডাল,কোয়াশের তরকারি, মটরের আচার, চিকেন ভুনা। খাওয়া দাওয়া সেরে দেরি না করে শুয়ে পড়লাম। পাহাড়ে যেমন রাত খুব তাড়াতাড়ি হয়, তেমনি সকালও হয় তাড়াতাড়ি। সারারাত ঘরের টিনের চালে কুয়াশা পড়ার টুপটুপ শব্দ আর সারারাত মাফিনের চিৎকারে প্রায় না ঘুমিয়েই কেটে গেছে রাতটা।

ছবি সৌজন্যে ঃ অঙ্কিতা বিশ্বাস

ভোর পাঁচটায় বিছানার পাশের জানালা খুলে দেখি নাইরে পরিষ্কার আকাশ, মেঘেরা মনে হয় আজ ছুটি নিয়েছে। জানালা দিয়ে মুখ বাড়াতেই দুটো পাইন গাছের মাঝ দিয়ে দেখা গেল কাঞ্চনজঙ্ঘা। শীতের পোশাক চাপিয়ে ঘর থেকে বেড়িয়ে বাইরের খোলা ছাদে গিয়ে দাঁড়ালাম। সত্যি এক মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। সূর্যোদয় হতেই চোখের সামনে ধরা দিল "Sleeping Buddha"। একে একে দূরে দেখা মিরিক, দার্জিলিং, টাইগার হিল, ঘুম, সোনাদা, ধোত্রে, বেলতার আর নীচের দিকে অসংখ্য চা বাগানের মধ্যে দিয়ে আঁকাবাঁকা পথ। এরই মধ্যে ধোঁয়া ওঠা গরম চা এর কাপ হাতে পেলাম। ওনারা আমাদের যেই চা দিয়েছিলেন তার অসাধারণ স্বাদ। একরকমের flavoured tea (Passion fruit tea– first flush)। আমি চা প্রেমিক নই, তবে এই চায়ের স্বাদ আমার ভীষণ ভালো লেগেছিল। পরোটা, ঘুগনি, ডিম সেদ্ধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে ব্যাগপত্র গুছিয়ে বেড়িয়ে। পড়লাম সাড়ে দশটা নাগাদ। বেশ ভালোই কেটেছে একটা দিন পাইনের জঙ্গলের মাঝে। রাজু ভাইয়া ওনার গাড়ীতে আমাদের চিমনি 5500ft, কার্শিয়াং এর সবচেয়ে উঁচু জায়গা, ছোট্ট একটি পাহাড়ি গ্রাম নিয়ে গেলেন। চিমনি হেরিটেজ গার্ডেনে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের তৈরি এক বিশাল চিমনি রয়েছে যা প্রায় একশো বছরের পুরনো। এছাড়াও এখানে একটি ভিউ পয়েন্টও রয়েছে। ওখানে এক জায়গায় আমরা বিভিন্ন স্বাদের চা খেয়ে দেখলাম যেমন chamomile tea– blueberry tea mango tea.. ওখান থেকেই সংগ্রহ করলাম আমার পছন্দের blueberry tea আর passion fruit tea. চিমনি থেকে আমরা গেলাম ডাউহিল পাইন ফরেস্টে। সেদিন আকাশ পরিষ্কার থাকায় আর পাইন ফরেস্ট ভেদ করে ঝলমলে রোদ প্রবেশ করায়। ডাউহিলেরসেই গা ছমছমে পরিবেশ আমরা পাইনি। এরপর সেখান থেকে গেলাম ডাউহিল স্কুল, হনুমান টক। গাড়ি আমাদের কার্শিয়াং টয়ট্রেন স্টেশনের কাছে নামিয়ে দিল দুপুর আড়াইটা নাগাদ। সেখান থেকে শেয়ার কারে ফিরে এলাম শিলিগুড়ি।

২. রাত্রি ৩ দিনের এর ছোট্ট এই সফর সত্যি মনে রাখার মতো। পাহাড়ের যে কত রকমের রুপ রঙ আর সময়ের সাথে সাথে তার যে ছন্দ পরিবর্তন নিজের চোখে না দেখলে হয়তো তার বর্ণনা দেওয়া সম্ভব নয়। খুব কাছ থেকে প্রকৃতির এই নৈসর্গিক সৌন্দর্য মনে এক অনন্য অনুভূতি এনে দেয়। তাই হয়তো বারংবার ছুটে যাই পাহাড়ের ডাকে। পাহাড় আমার দ্বিতীয় বাড়ি, ভালোবাসার জায়গা, মন খারাপের সঙ্গী। পাহাড় আপনাকে কখনো খালি হাতে ফেরাবে না, আপনি ঠিক কিছু সুখকর স্মৃতি ঝুলি ভরে নিয়েই ফিরবেন।

# Defunct United Nations

**Chinmayakar Das**
**Associate Professor, Department of Political Science**

The role played by the United Nations vis-à-vis the United States, has evidently brought out the international organisation in a poor picture and proclaimed to the world its defunct status. Though there have been few other instances not involving the US where the UN has largely remained a mute spectator. The latest example is Russia's invasion of Ukraine. However, on most of the occasions, it has been the USA which has adopted arm twisting and bargaining methods in the United Nations to have its way. How did this situation come about? The story of the League of Nations is repeated, though a bit differently. But the fact lays in the arrogance of primarily the US and the quiet of others.

No doubt, USA is a powerful country with a very rich resource base. Contrasting this with India, the resource base of India has been used over a period of thousands of years. Discounting the period of Red Indians, the tapping of resources at a faster pace in USA did not begin more than 200 to 250 years ago. So, it can feel proud of its inherent strength at present, along with a strong technological base. However, instead of being feeling proud, a kind of arrogance began to set in. The same display of arrogance can be seen with regard to Russia and China.

This arrogance began to show in its dealings with other countries of the world. The formation of the UNO also saw the emergence of two cold war blocks. A kind of race began for satellite states by both the blocks, by hook or by crook, a carrying forward of the policy of colonialism under a different garb by different players. The executive power which was vested in only a few hands in the United Nations can be seen in democratic light as quite undemocratic. Why not decide by majority vote by all the members? This can prove to be a road map to world peace and establishment of democratic norms at large. The USA, the most vociferous votary of democracy propagation around the world, has shown some of the most undemocratic behaviour and hegemonic character against international norms right from the time of Monroe Doctrine to Iraq to date. The media propaganda carried out by USA turns out to be a potent force in distorting the facts on ground, be it ethnic cleansing in former Yugoslavia or weapons of mass destruction in Iraq.

It is true that national interest is paramount in international relations. But trampling the national and human sentiments of others does not behove a great country, be it USA, Russia or China. We are witness to various cross currents in international politics and strategic thinking which on many occasions has been harnessed fruitfully by the UN. But on many occasions we have been witness to situations where USA has tried to have its way by circumventing the UN by various not so good means to have its ends, even at the cost of compromising the status and dignity of other countries.

Under the circumstances what are the reasons for the United Nations always putting up a poor show vis-à-vis the USA. One reason as mentioned above is the undemocratic character of both the USA and the Security Council. Second reason might be of its headquarters being located in the heart of USA, in New York. The staff members and other related members serving the UN have to go and live there while working with the UN. They are the world's policy framers. It is but natural for them to get influenced by USA's way of thinking. The local environment moulds to a great extent their decisions taken in the forums of UN. There the USA gains an upper hand vis-à-vis UN and other countries. This can be one of the probable reasons, with other major and minor reasons, for the USA bringing the UN under its fold.

To offset this imbalance, a simple solution can be provided by shifting the headquarters of the UN from New York to some lonely island solely owned by the UN and with only the headquarters of UN on the island. Besides, any landlocked territory can be visualised on the pattern of Vatican City. In such situation, outside unwarranted influences can be checked to a great extent. The present circumstances demand fulfilment of this hypothesis to save itself the ignominy of the League of Nations.

Mainak Sinha
First Semester, English Department